International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/52
VOLUME: VIII, ISSUE: 2 || June, 2026 || Double Blind Peer Reviewed || pp 21-29



International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

The Influence of the Language Movement and the Liberation War on Momtazuddin Ahmed's Plays: An Awakening of Consciousness
মমতাজউদদীন আহমদের নাটকে একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব: চেতনার জাগরণ

চিন্ময় কুমার মল্লিক (Chinmoy Kumar Mallick)
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ
Email: chinmoy.kumar@science.wub.edu.bd

ARTICLE INFO

Article History
Received: 15.02.2026
Revised: NA
Accepted: 05.04.2026
Published: 30.06.2026

Keywords
21st
Liberation war
Consciousness
Allegory
Dramatic Elements

ABSTRACT

Bangladeshi playwright Momotazuddin Ahmed, in his plays, has called upon the people to rise up against the oppressed and oppressed people and the defeated forces of 1971. He has also highlighted the language movement, the liberation war and the social reality of post-independence Bangladesh. The Ekushey spirit was the main motto of the language movement, which strengthened the non-communal spirit of Bengalis during the liberation war. His role in making drama a weapon of protest and resistance and creating a cultural revolution among the people was undeniable.

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ এর ভূমিকা পালন করেন মমতাজউদদীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)। তিনি একাধারে অধ্যাপক, নাট্যকার, নির্দেশক, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার, মুক্তিযোদ্ধা সর্বোপরি একজন সংবেদনশীল মানুষ। বাংলা ভাষী মানুষের কাছে তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় একজন নাট্যকার হিসেবে। মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর রচিত নাট্যকর্মে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের দেশের সামগ্রিক চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে

CC BY NC

সক্ষম হন। তিনি নাটকে জীবনের কথা, যৌবনের কথা বলেছেন নির্দ্বিধায়। মুক্তিযুদ্ধের কথা, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের কথা এবং একাত্তরে পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠেছে কখনো নাটকে আবার কখনো সৃজনশীল গদ্যে। বর্ণিল বিষয়ের ওপর তিনি নাটক রচনা করলেও একাঙ্ক শ্রেণির নাট্যরচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। সেসব নাটকে বিশেষত ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতাভিত্তিক নাট্যরূপায়ণে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট নাটকে চরিত্রগুলো কথা বলছে কখনো ধীরলয়ে, কখনো উচ্চস্বরে, কখনো তির্যকভাবে, কখনো রসালোভাবে আবার কখনো প্রতীকী ঢঙে। চরিত্রানুযায়ী কথাগুলোকে যথাযথভাবে সাজালে হয় সজীব সংলাপ, প্রতিফলিত হয় সাহসী বক্তব্য। সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী মমতাজউদদীন হাস্য-কৌতুকময় বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জীবনের কোনো গভীর সত্যের সন্ধানই তাঁর নাট্যসাহিত্যের প্রবণতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে গেছেন। সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রতি এই দায়বদ্ধতাই তাঁকে নাট্যরচনায় অধিক উৎসাহী করে তুলেছিল।

২.০ গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে নাট্যকারের সৃষ্টি অসংখ্য নাট্যকর্মের মধ্যে একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-নির্ভর নাটকের উৎস সন্ধান ও পাঠকের মনে চেতনাগত জাগরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। গতানুগতিক নাট্যধারার বাইরে নাট্যকার কীভাবে নতুন নাট্যআঙ্গিক নির্মাণ এবং কাহিনী বর্ণনায় কৌশলী হয়েছেন সেদিকটিও স্পষ্ট করা হয়েছে। নাট্যকার নাটককে শুধু বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই দেখেননি পাশাপাশি নাট্য আন্দোলন কীভাবে জনমনে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করতে পারে সেদিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে অর্থাৎ একাঙ্ক নাটকের মাধ্যমে কীভাবে হাস্য-কৌতুকের অন্তরালে মানুষের মৌলিক দিকগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। নাট্যকারের একুশ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যকর্মে ইতিপূর্বে যেসব গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে তার সঠিকতা যাচাই করে নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গবেষণাকর্মে নির্ধারণ হতে পারে-

- ক. নাট্যকারের নাটকের প্রতি আগ্রহের কারণ।
- খ. একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগরণ।
- গ. রূপকের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচন।
- ঘ. সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.০ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাকর্মটির তথ্যনির্দেশ ও টীকা MLA পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। এছাড়া বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘বাংলা বানান অভিধান’ গ্রন্থটি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪.০ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

মমতাজউদদীনের নাট্যজীবনের যাত্রা শুরু হয় ছেলেবেলা থেকে। তাঁর মামা-চাচারা অভিনয় করতেন নাটকে আর শিশু মমতাজ মায়ের কোলে বসে নিভৃতে সেসব নাটকের অভিনয় উপভোগ করতেন। ফলে নাটকের প্রতি ভালোবাসা ও দুর্বলতা তাঁর তৈরি হয়েছিল শৈশবেই। ছাত্রজীবনে অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি নাটকে অভিনয় করেছেন মনের তাগিদ থেকে। কর্মজীবনে তাঁর পেশা ছিল অধ্যাপনা আর নেশা ছিল নাট্যচর্চা। আমৃত্যু নাটকের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এই নাট্যকার নিজেই লিখেছেন, “নাটক নাটক করেই জীবনের ষাট-সত্তর ভাগ সময় কাটিয়ে দিলাম।

নাটক আমাকে দু'হাত ভরে ভালোবাসা আর ভাবনা দিয়েছে। যেখানেই গেছি, ছোট-বড় যা কিছু বলেছি, শুনে লোকে বলেছে, নাটকেও যেমন, বাস্তবেও তেমন।" (আহমদ, ২০০০:২৫)। নাটকের প্রতি এই ভালোবাসার অংশ হিসেবে মাত্র ২৫ বছর বয়সে অর্থাৎ স্বাধীনতার এক দশক আগে চট্টগ্রামে অবস্থানকালে ১৯৬০ সালে মহা উৎসাহ নিয়ে তিনি প্রথম নাটক 'তবু আমরা বাঁচব' রচনা করেন। যদিও সেটি পরিপূর্ণ নাটক হয়নি তবে ছায়ানাট্য ছিল বটে! ধীরে ধীরে তিনি বেতারেও নাটক লেখা শুরু করলেন। নাটকের প্রতি এই একান্ত উচ্ছ্বাসকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে, "আমার নাট্যকর্মে শ্রম সাধনা হয়তো নেই, কিন্তু দিনরাত্রির মজুরি আছে। যেখানে যাই সেখানে আমার সঙ্গে নাটক যায়। পড়ছি উপন্যাস, কিন্তু ভাবছি নাটক। লিখছি নিবন্ধ, গুছিয়ে নিচ্ছি নাটক। কথা বলছি বিজ্ঞান, এসে গেল নাটক। (আহমদ, ২০০০: ৩১)। যমজ ভাইয়ের মতো নাটককে তিনি ধারণ করতেন ও লালন করতেন। নাটক হয়তো তাঁকে অনেক অর্থ-বিত্ত দেয়নি, তবে খ্যাতি-যশ দিয়েছে অফুরন্ত। সেই নাটক নিয়েই তাঁর শৈল্পিক মানস উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাঙালি জাতির জীবনে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। এই আন্দোলন কেবল ভাষার জন্য আন্দোলন নয় বরং এটি ছিল একটি জাতির চেতনার আন্দোলন। আন্দোলনের বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল মানবিক শক্তি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাগরণের বহিঃপ্রকাশ। ফলশ্রুতিতে বাঙালি জাতি সেসময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজপথে নেমেছিল। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি অসংখ্য মানুষ হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের সর্বাত্মক আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রথম প্রতিবাদী নাটক 'কবর' রচনা করেন মুনীর চৌধুরী এবং পরবর্তীতে 'বিবাহ' শিরোনামে নাটক রচনা করেন মমতাজউদ্দীন আহমদ। দুজনের নাটকেই ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে ঘিরেই রচিত। নাট্য গবেষক মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন লিখেছেন, "মুনীর চৌধুরীর কবর নাটকের পর ভাষা-আন্দোলনভিত্তিক দ্বিতীয় কোনো সার্থক নাটকের নাম উচ্চারিত হলে তা অবশ্যই হবে মমতাজউদদীন আহমদের বিবাহ। দুটো নাটকেই রয়েছে ভাষা ও দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং মানুষের অস্তিত্ববাদী চেতনা।" (স্মারকগ্রন্থ, ২০২০: ১২৯)। এরি ধারাবাহিকতায় নাট্যকারের সৃষ্ট প্রতিবাদী চরিত্রগুলো সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাহান্ন থেকে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সকল স্বাধিকার আন্দোলনে তখন নাট্যকাররা নাটক রচনা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবাদী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে বিপ্লবী জাগরণের সৃষ্টি হয় তা দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতার নাট্য আন্দোলনের ফসল।

নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের ছোট-বড়, বেতার, রূপান্তর মিলিয়ে রচিত নাটকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের অধিক। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে নাট্যকারের একুশ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যালোচনাই থাকবে। এর ভেতর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকই তিনি বেশি রচনা করেছেন। কারণ নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি কলমযোদ্ধা হয়ে নাটক লিখেছেন ও মঞ্চস্থ করেছেন। ভাষা আন্দোলনকে তিনি ধীরে ধীরে স্বাধিকার আন্দোলনে নিয়ে গেছেন। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর রচিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল। দুটি নাটককে একসাথে তিনি নাট্যগ্রন্থে রূপ দিয়েছেন।

'বিবাহ' নাটকের প্রেক্ষাপট ভাষা আন্দোলন হলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক 'কী চাহ শঙ্খচিল' নাটকের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। নাট্যকার নিজেই এই নাট্যগ্রন্থের ভূমিকায় নাটক দুটির সাদৃশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "বিবাহ নাটকের সখীনা এবং কী চাহ শঙ্খচিলের রওশনআরা আবেগ ও যন্ত্রণার সূত্রে আমার কাছে অভিন্ন চরিত্র। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন স্বাধিকার এবং একাত্তরের যুদ্ধ স্বাধীনতার শপথে যেমন ধারাবাহিক সূত্রে গ্রথিত তেমনি বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল একই আবেগ ও বেদনার ধারাবাহিক বিকাশ।" (আহমদ, ২০০০: ১১১)। নাটক দুটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৫ সালে। একটু দেরিতে রচিত হলেও বিবাহ নাটকে ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি নাট্যকার উপেক্ষা

করতে পারেননি। 'বিবাহ টেলিভিশনে ও বেতারে প্রচারিত হয়েছে এবং যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।' (সিদ্দিকী, ২০০৫: ৪০)। ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে রচিত এই নাটকে নাট্যকার তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। নাটকে সখীনা নামক বালিকার সাথে রফিক নামক জনৈক যুবকের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সখীনা গায়ে হলুদ মেখে বরের প্রতিক্ষায় থাকে কিন্তু বর তার পূর্বেই লাশ হয়ে ফিরে আসে। ভাষা আন্দোলনের বিরোধীরা সেই লাশের জানাজা হতে না দিয়ে লাশকে গুম করে দিয়েছে। সখিনার ভাগ্যে জুটল বৈধব্য। গবেষকের ভাষায়, "বিবাহ নাটকের সখীনারও সাধ ছিল, স্বপ্ন ছিল। সে যখন গায়ে হলুদ আর হাতে মেহেদী মেখে বধূ বেশে বসেছিল... সখীনার চেতনার সেই হলুদের রঙ রক্তের মতোই গভীর। মোছা যায় না।" (জয়নুদ্দীন, ১৩৯৫ব.)।

বহু বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশে তার মামাতো বোন দোলনের বিয়ে যখন যৌতুকের কারণে আটকে যায়, তখন সখীনা সমস্যার সমাধান করেছে। হতাশাগ্রস্ত লালু মামা সখীনাকে দেখে বলে, "লালু: সখীনা তুই হাসিস না। এটা ফেব্রুয়ারি, এটা কান্নার মাস। / সখীনা: কান্না। তাহলে তো আমি ফুলে ফুলে হাসব লালু মামা।/ সখীনা: আমি আছি তো। আমি যাব আনিসের বাবার কাছে।" (আহমদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ২৭)। যৌতুকলোভী দোলনের শ্বশুরকে সখিনা নিজের অলঙ্কার দিয়ে পরিবারের সম্মান রক্ষার পাশাপাশি মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। নাট্যকার ভাষা আন্দোলনে শহীদের বাগদত্তা সখিনার মাধ্যমে অধিকার আদায়ের চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছেন। এক নাট্যগবেষক বলেছেন, 'দু'টি খণ্ডে বিভক্ত নাটকটি, ভাষা আন্দোলনের মিছিল, স্লোগান, গুলি ও রাজনীতির বাইরে একটি দিককে আলোকিত করেছে। ভাষা আন্দোলনের গতানুগতিক নাট্যধারার ব্যতিক্রম এ নাটক বিষয়ে স্বতন্ত্র্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে।' (সিদ্দিকী, ২০০৫: ৪০)। নাটকের নায়ক রফিক বাস্তবের চরিত্র হলেও নাট্যকার সখীনা চরিত্র ও বাকি অন্যান্য চরিত্র কল্পনায় এঁকেছেন। নাটকটি সরাসরি ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত নয় বরং ভাষা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচনা করা। এমনকি সখীনার বাবাকেও নাট্যকার বাংলা ভাষা, স্বাধীনতা ও মানবতার পক্ষের একজন দরদী মানুষ রূপে নির্মাণ করেছেন। তিনি ভাগ্নী আতিয়ার সাথে কথোপকথনকালে বলেছেন, "ঢাকাতে শুনছি ছাত্ররা খুব ক্ষেপে গিয়েছে আতিয়া। মিছিল করবে, হরতাল করবে, করবেই তো। বাংলা ভাষাই যদি না থাকে তো কিসের দেশ, কিসের স্বাধীনতা!" (আহমদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ৫৩)। এভাবে ভাষার পক্ষে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে নাট্যকার চরিত্রদের সংলাপে স্পষ্ট করেছেন। তাছাড়া বিবাহ নাটকে নাট্যকার গতানুগতিক নাট্যধারা ভেঙে নিজস্ব ভঙ্গিতে নাট্যরস উপস্থাপন এবং একুশের চেতনাগত দিককে তিনি সখীনা ও তাকে ঘিরে থাকা চরিত্রদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই নাট্যগ্রন্থের অপর নাটক 'কী চাহ শঙ্খচিল' হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। নাট্যকার বিবাহ নাটকের সাথে কী চাহ শঙ্খচিল নাটকের একটা সাদৃশ্য আনার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার চট্টগ্রামে কর্মরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুর এক বড় অংশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধ গ্রথিত। মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং মুক্তির শুদ্ধ চেতনায় জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি সেসময় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যরচনা ও মঞ্চায়নে নিমগ্ন হন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন নাট্যচর্চার মাধ্যমে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কী চাহ শঙ্খচিল নাটকে বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের দ্বারা ধর্ষিত গৃহবধূ রৌশানারা নামক এক বীরাঙ্গনার কাহিনী। বারোটি দৃশ্যের এই নাটকে চরিত্র সংখ্যা পাঁচটি। রৌশানারা সন্তানসম্ভবা হয়ে অপেক্ষা করে স্বামী গৃহে ফিরে এলে তাকে আনন্দের সংবাদটি দেবে। কিন্তু স্বামীর ফেরার পূর্বেই পাকিস্তানি হানাদাররা তাদের বাড়ি এসে রৌশানারাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বারো দিন ধরে তারা তাদের ক্যাম্পে ধর্ষণ করে। দেশ স্বাধীনের পর ফিরে আসলে বীরাঙ্গনা হিসেবে দেশের মানুষের কাছে সম্বোধিত হয়েছে সত্য কিন্তু নিজ স্বামীর কাছে সে ষড়যন্ত্রের খেলনা হয়েছে মাত্র। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তার স্বামী তাকে ও পুত্র লালনকে আশ্রয় দিয়েছে। স্বামী ঐশ্বর্যশালী হয়ে গেলে কৌশলে পুত্র লালনকে

হত্যা করে এবং রৌশানারাকে পাগল বানিয়ে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুত্রহারা রৌশানারা চিৎকার করে বলেছে, "যুদ্ধকে নিয়ে তোমরা ভাগ্য গড়ে নাও, সাধের সিংহাসন মজবুত কর...কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য করতে চাও কেন? আমার সন্তানের পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন?" (আহমদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ২০০)। ,রৌশানারার এই বুকফাটা আর্তনাদ ও জাতির কাছে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ এটি অবশ্যই আমাদের বিবেককে তাড়িত করে। যদিও নাটকের শেষভাগে ,রৌশানারার পুরনো প্রেমিক বিলেত ফেরত ডাক্তার হান্নান তার চিকিৎসার যাবতীয় দায়ভার গ্রহণ করেছে তবুও সে একরাতে পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি পর তাকে পাওয়া বালুকাবেলায় এক উন্মাদিনী হিসেবে।

নাট্যকার এই নাটকটিকেও গতানুগতিকভাবে বর্ণনা করেননি। তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধের অন্তরালে মানুষের মানসিক ক্ষতির দিকটিও নাট্যকর্মে উপস্থাপন করেছেন। নাটকে 'শঙ্খচিল' বলতে নাট্যকার স্বাধীনতার অশুভ শক্তিকে বুঝিয়েছেন। যেখানে নাট্যকার রৌশানারার স্বামীকে স্বাধীনতা পরবর্তী সুবিধাবাদী শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তবে স্বাধীনতার পর রৌশানারা সমাজের কাছে নির্যাতিতা নারী হিসেবেই রয়ে গেছে। দেশের প্রতি তাঁদের এই অপরিসীম আত্মত্যাগ আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতার সুফল দিয়েছে সত্য তবে আমরা তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি এটা আমাদের ব্যর্থতা। গবেষকের ভাষায়, "রক্ষণশীল মানসিকতা সম্পন্ন সমাজ ও ব্যক্তি যুদ্ধোত্তর আবেগ তাড়িত হয়েছিল সাময়িক সময়ের জন্য। সময়ের প্রবাহে একসময় আলো লুপ্ত হয় এবং সমাজ ও ব্যক্তি প্রকৃত অবয়বে প্রকাশিত হয়। বীরাঙ্গনা রৌশানারা যথারীতি শ্রদ্ধার্ঘ বঞ্চিত হয়।" (সিদ্দিকী, ২০০৫: ৪২)। এই বীরাঙ্গনাদের দেশের জন্য আত্মত্যাগ না থাকলে হয়তো আমাদের স্বাধীনতা এত সহজে আসতনা। বিনিময়ে তারা লাঞ্ছনার শিকারও হয়েছেন কখনো কখনো। এই নাটকে রৌশানারা সব হারিয়ে শুধু স্বামীর পাশে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাও সম্ভব হয়নি। নাট্যকার এক জায়গায় লিখেছেন, "মূল প্রতিপাদ্য নারীর মর্যাদা। রৌশানারা সম্মান হারিয়েছে, সন্তান হারিয়েছে, সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তারই আপন জনদের দ্বারা। তারপরও সে হারাতে চায় না তার শেষ সম্বলটুকু; তার স্বামী ও স্বামীর ঘর।" (আহমদ, ২০০০: ৫৯৯)। ফলে এই নাটকে শঙ্খচিল নামক স্বাধীনতোত্তর সুবিধাভোগীদের ধূর্তপনার পাশাপাশি রৌশানারার মতো বীরাঙ্গনাদের সততার চিত্র নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাট্য সংকলনের প্রথম নাটকই হলো একই শিরোনামের নাটক। নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চারটি পারস্পরিক সংযোগের নাটককে একত্রিত করে এই নাট্যসংকলন প্রকাশ করেন ১৯৭৭ সালে। নাট্যকারের প্রথম রাজনৈতিক নাটক হিসেবে এটি রচিত হয় ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। "লেডি গ্রেগরির 'দি রাইজিং অফ দি মুন' নাটিকা অবলম্বনে এটি রচিত হয়েছে।" (সিদ্দিকী, ২০০৫: ২৮)। এটি নাট্যকারের রূপান্তরিত নাটক হলেও সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্পৃহা প্রতিফলিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে অর্থাৎ একাত্তরের ২৮শে ফেব্রুয়ারি নাটকটি চট্টগ্রাম কলেজে মঞ্চস্থ হয়। চারটি চরিত্র ও একটি দৃশ্যের এই নাটকে সরকারের সামান্য বেতনভুক্ত দারোগা নূর মোহাম্মদ এর উপর দায়িত্ব পড়ে বিপ্লবী নেতা গরিবুল্লাহর ছদ্মবেশধারী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ধরার জন্য ফেরিঘাটে টহল দেওয়ার। সরকারের পক্ষ থেকে এই দায়িত্বে সফলকারীকে দুই হাজার টাকা পুরস্কার ও পদোন্নতি ঘোষণা করা হয়। এসব সত্ত্বেও নূর মোহাম্মদ দেশ প্রেমের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী মোয়াজ্জেমকে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে এবং তার সহকর্মী দলিলুর রহমানকে হত্যা করেছে। সে দেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাকামী মানুষদের ভালোবাসে। তাইতো বিপ্লবীর সাথে কথোপকথনকালে বলেছে, "যদ্দিন বাঁচব দেশের জন্য কাঁদব। দেশকে ভালোবাসা তো পাপ নয়। যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে তাদেরকে আমিও ভালোবাসি গরিবুল্লাহ।" (আহমদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ৭৪)। দারোগা বিপ্লবীর প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে তার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলে।

তাদের আলোচনায় উঠে আসে সংসারের কথা, রাজনীতির কথা, ইংরেজদের কথা, এবং পাকিস্তানি বাহিনীর শাসন ও শোষণের কথা। নূর মোহাম্মদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সত্যবাদী ও সৎ বলে বিপ্লবীকে বাঁচাতে সহায়তা করেছে। গবেষকের ভাষায়, "নাট্যকার নূর মোহাম্মদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বের করে এনেছেন মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার আনুগত্য এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষাকে।"(স্মারকগ্রন্থ, ২০২০: ২৮৮)। এছাড়া নাট্যকার নাটকে বিপ্লবী চরিত্রের কণ্ঠে গানের সংযোগ করে নাটকের পরিবেশকে অন্যধারায় নিয়ে গিয়েছেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নাটক শেষ করেছেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গান দিয়ে।

'এবারের সংগ্রাম' নাটকটি রচিত হয় ১৯৭১ সালের ১৪ই মার্চ মধ্যরাতে। সেটি মঞ্চস্থ হয় ২৫শে মার্চ চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানে। রূপকধর্মী এই নাটকে নাট্যকার স্বাধীনতা বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচনের পাশাপাশি সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য সংবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপও উন্মোচন করেছেন তিনি [১৫]। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তখন থেকেই মুক্তিকামী বাঙালিরা একত্রিত হতে থাকে। নাট্যকার রূপকের আড়ালে নাটকে ইয়াহইয়া খানের চরিত্রকে সাজিয়েছিলেন বাদশাহ চরিত্রের মাধ্যমে, উজিরকে সাজিয়েছেন ভুট্টো সাহেব ও সিপাহসালারকে নির্মাণ করেছেন টিক্কা খানের ভূমিকায়। এরা সবাই শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। নাটকের শুরুতে ইয়াহইয়া খান রূপী বাদশাহ দম্ভোক্তি করে বলেছে, "আমি হলাম এই দেশের বাদশাহ। এই মস্ত বড় দেশের লম্বা চওড়া দেখছ, আমি এর তামাম জানমালের মালিক। আমি কী করতে পারি? আমি সব কিছু করতে পারি।" (স্মারকগ্রন্থ, ২০২০: ৮১)। বাদশাহ তার সহযোগীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানিয়ে, প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার কথা বলে আপন স্বার্থ সিদ্ধি করে। সিপাহসালারকেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজে লাগিয়েছে কিন্তু তাদের ছলনায় বেশিদিন কাজ হয় না। মানুষ জেগে ওঠে অমানুষ সিপাহসালার ও বাদশাহর বিরুদ্ধে। মুখোশ উন্মোচিত হয় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির। নাটকে মানুষ নামক চরিত্রটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ এদেশের কোটি মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। মানুষ বলেছে, "ভাইসব, এদেশ চিনে রাখ, এরা ধর্মের নামে, সংহতির নামে, নানা ফন্দির জাল বিস্তার করে আমাদের শোষণ করছে। আর এদের ছেড়ে দিও না। এবার এরা ঘরে ঘরে ঢুকে সন্তানকে হত্যা করবে। এরা খুনি। মানুষের রক্তের বিনিময়ে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে আনে, তোমরা এদের নির্মূল কর।" (স্মারকগ্রন্থ, ২০২০: ৯৪)। নাটকের শেষ সংলাপে ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সেই 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম' অমোঘ বাণীটি।

'স্বাধীনতা সংগ্রাম' নাটকটি রচনা করা হয় ১৯৭১ সালের ২১শে মার্চ এবং প্রদর্শিত হয় ২৪শে মার্চ চট্টগ্রাম প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে। এখানেও মুক্তিকামী মানুষদের স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত করতে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেন। গবেষকের ভাষায়, "এ নাটকেও লক্ষ দর্শক উপস্থিত হয়। পূর্বোক্ত নাটকের মত এটিও জনগণকে সাহসী করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা আবশ্যিক কর্তব্য বিবেচনা করে মমতাজউদদীন 'এবারের সংগ্রাম' ও 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' নাটক দুটি রচনা করেন।" (সিদ্দিকী, ২০০৫: ২৯)। নাটকটি রচনার মাধ্যমে নাট্যকারের রাজনীতি সচেতনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনের দিকটি স্পষ্ট হয়ে যায়। নাটকটিতে নাট্যকার পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বাঙালিদের প্রতিবাদী রূপরেখাও অঙ্কন করেছেন। আটটি চরিত্রের সমন্বিত এই নাটকে বর্গীওয়ালা ও হুকমত খাঁ রাইফেলের ভয় দেখিয়ে বাঙালি দুখু মিয়াকে দিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামের পোস্টার ছিঁড়াচ্ছে। এখানেও নাট্যকার রূপকধর্মিতার আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ বর্গীদের অত্যাচারকে তিনি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এনে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি দুখু ও ঝকড়ুর প্রতিবাদ ও নাটকে সংগ্রামী চেতনা

ফুটিয়ে তুলেছেন। গবেষকের ভাষায়- 'নাট্যকার গভীর রাতে বধ্যভূমির চিত্র তুলে ধরেছেন। পাক সেনাবাহিনীরা এদেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, গায়ক, শ্রমজীবী নির্বিশেষে হত্যা করে ফেলে দিত। তাদের কোনো দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হতো না।' (জাহান, ২০০৩: ২১৫)। অর্থাৎ নাটকে বর্গী রূপে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের চিত্র এভাবে ফুটে উঠেছে। তবে নিপীড়িত বাংলার মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ মুখরিত জনপদের উন্মাতাল অবস্থানকেও নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। বর্গীদের অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞে অতিষ্ঠ হয়ে দুখু ও ঝকড়ু একসময় তাদের আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়। ঝকড়ুর সংলাপে স্পষ্ট, "এক বাড়িতে ঢুকে দেখি, তিনটে লাশ রক্তের মধ্যে ভাসছে...বাচ্চাটা মায়ের দুধে ঠোঁট দিয়ে রক্তে মধ্যে পড়ে আছে। বাচ্চাটা তখনও ছটফট করছে। আমি পারলাম না, পালিয়ে এলাম.... মালিক হামি পারবে নাই।" (আহমদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১০৩)। শুধু তাই নয় নাটকটির শেষভাগে এসে দুখু ও ঝকড়ু চরম প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। যখন তারা দেখে বর্গীরা তাদেরকেই দিয়ে বাঙালির লাশকে ট্রাকে তুলতে বলছে তখন হুকমতের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দুখু ও ঝকড়ু ।

"দুখু: আমি ওকে মেরে ফেলব। ঝকড়ু: জয় বাংলা। দুখু ভাই, আমি হুকমতকে ধরেছি, তুমি বর্গীকে ধর। দুখু: তেইশ বছর সহ্য করেছি, ভালোবেসেছি, দয়া করেছি। কিন্তু তোমরা ভালো হওয়ার নয়।" (আহমদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১১০-১১১)। নাট্যকার এখানেও বঙ্গবন্ধুর সেই অমোঘ বাণী 'এবারের সংগ্রাম: স্বাধীনতার সংগ্রাম' সংলাপ দিয়ে ও দেশাত্মবোধক গানের ব্যবহার করে নাটকটির ইতি টেনেছেন।

'বর্ণচোরা' নাটকটি স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের প্রথম ফেব্রুয়ারিতে রচিত হয়। নাটকের নামকরণের মধ্যে একপ্রকার রূপকতা আছে, যেখানে তাদের মুখোশ উন্মোচনের ধারণা পাওয়া যায় । নাটকটির সমকালীন জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন, "মমতাজউদদীন আহমদ রচিত নাটকসমূহের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক 'বর্ণচোরা'...দর্শকবৃন্দ নাটকটির প্রতিটি সংলাপের সাথে গভীর একাত্মতা অনুভব করে।" (সিদ্দিকী, ২০০৫: ২৯)। নাটকে গোলাম সাদেক রঙ বদলানো একজন রাজনীতিবিদ। যে চল্লিশ বছর ধরে পাক শাসকদের গোলামি করে অন্যায়-অপকর্মে ইন্ধন জুগিয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর সে মনে-প্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মানতে পারেনি। তাঁর সংলাপে স্বাধীনতা বিরোধিতা ফুটে উঠেছে, "বাঙালির বুদ্ধিকে কেটে টুকরো টুকরো করে দাও বাতেন ইবনে খাইয়াম। কাউকে বাঁচতে দিও না, যদি কায়েদে আজমের এই পাকভূমি পাকিস্তানরে বাঁচাতে চাও।" (আহমেদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১২৫)। আবার দেশ স্বাধীনের পর জনগণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিজেকে সৎ দাবি করে, কুকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অভিনয় করে। বর্ণচোরা, ধূর্ত সাদেক বলেছে, "আমি বেকুফ, ক্লাসওয়ান ইডিয়ট। আমি ভুল করেছি কিন্তু আজ আবার ভুলের মাফ চাইছি। বলুন, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।" (আহমেদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১১৬)। অর্থাৎ তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়েছেন। যে সাদেক তার বৌমা বর্ণালীকে একসময় সাম্প্রদায়িকতার লেবেল এঁটে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার জন্য চরম তিরস্কার ও ধমক দিয়েছিল সেই সাদেক আজ আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য রবীন্দ্র ভক্ত হয়ে উঠেছে, ফুলকে ভালোবাসতে শিখছে। বর্ণালীকে ডেকে বলেছে, "বৌমা একটা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আমার মতিকে ঘুম পাড়িয়ে দাওগে যাও। রবীন্দ্রসংগীত গাও।" (আহমেদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১১৮-১১৯)। এই সাদেকরা আসলে মুখোশধারী, এরা কখনো বদলায় না। নাটকের প্রতিবাদী চরিত্র জহুরুল বর্ণচোরা সাদেককে ঘৃণা করে, জনতার আদালতে তার বিচার প্রার্থনা করে অতীতের ঘৃণিত কুকর্ম তুলে ধরে বলেছে, "ইনি গোলাম সাদেক, আমাদের জাতীয় আন্দোলনে এবং প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক চেতনায় অতীতে কয়েকটি আঘাত হেনেছেন...ইনি ভাষা আন্দোলনের সময় আমাদের ভাইদের হত্যা করেছেন।" (আহমেদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১১৬)। এভাবে নাট্যকার স্বাধীনতা বিরোধীদের অস্তিত্বে আঘাত করেছেন।

ফলে নাট্যকারের এই নাটকটি আজও আমাদের দেশে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। এই বিদ্যমান অবস্থা থেকে সাধারণ মানুষকে অধিকতর সতর্ক থাকতে হবে, বর্ণচোরাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেই মানুষের চেতনাগত জাগরণ ঘটবে।

'এই সেই কণ্ঠস্বর' নাটকটি আরেক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক। নাটকটি ১৯৮৫ সালে রচিত হলেও ১৯৮৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। ঘটনাকাল ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ষোলোটি দৃশ্য ও আটটি চরিত্রের সমন্বিত এই নাটকের প্রথমেই দেখা যায়, গ্রামের এক বাড়িতে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আলী হায়দার অপেক্ষা করছে রাবেয়ার জন্য। রাবেয়া হলো তার সন্তান কাজলের বাগদত্তা। অধ্যাপক সাহেব মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছে একমাত্র পুত্র কাজল ও কন্যা কণাকে। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তাসাদদুক ও তার সন্তান মোজাম্মেলের পাকিস্তানপ্রীতি নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের ঘৃণিত রূপটি চিত্রিত করেছেন। পাশাপাশি কাজল ও কণার নিখোঁজের পর তাদের জন্য আপনজনদের যে বেদনা ফুটে উঠেছে, গবেষকের ভাষায়- "রাবেয়ার সীমাবদ্ধ বেদনা ও প্রতিক্ষা নাটকের কাহিনী হলেও, যুদ্ধকালীন নৃশংসতা, ক্ষমতালোভী স্বাধীনতা বিরোধীদের নগ্ন চরিত্রও নাটকে প্রাধান্য পায়।" (সিদ্দিকী, ২০০৫: ৪৩)। কিন্তু রাবেয়া বিশ্বাস করে, কাজল তার বোন কণাকে নিয়ে ফিরে আসবে। যদিও অধ্যাপক জানেন, তার সন্তানরা ফিরবে না। তাইতো রাবেয়া অধ্যাপককে বলেছে, "ও যতদিন ফিরে না আসে আমি অপেক্ষা করব। আমৃত্যু অপেক্ষা করব।" (আহমেদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১৭১)। দেশ স্বাধীন হয়েছে, বাঙালি জাতি স্বাধীন ভূখণ্ড, স্বাধীন পতাকা পেয়েছে, স্বাধীনতা ভোগ করার সাধ পেয়েছে কিন্তু রাবেয়া কী পেয়েছে? সে কি তার ভালোবাসাকে পেয়েছে? পায়নি। যে কাজল তাকে ফুল দিয়ে বাসর সাজাতে বলেছিল, বেনারসি শাড়ি পরে বউ সাজতে বলেছিল সেই কাজল আজ কোথায়? রাবেয়ার প্রতীক্ষার প্রহর যেন শেষ হয় না। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে ভেসে আসে কাজলের সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর। অদৃশ্য থাকা কণ্ঠে কাজল রাবেয়াকে বলছে, "রাবেয়া, তুমি ক্রোধ কোরো না, কেঁদো না, বেঁচে থাকব বলেই স্বাধীনতা এনেছি। আমাকে কখনো মৃত বলে ঘোষণা কোরো না...তুমি আমার বাংলাদেশ।" (আহমেদ, নাট্যসম্ভার, ১৯৯৯: ১৭১)। রাবেয়ার অন্তহীন অপেক্ষায় যেন নাটকটিকে পরিসমাপ্তি দান করেছে।

৫.০ ফলাফল ও ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের একজন অকুতোভয় নাট্যকার হিসেবে মমতাজউদদীন আহমদ একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর নাট্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে নাট্যরচনা করলেও বিচিত্র বিষয়কে তাঁর নাটকে যুক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই নাট্যকার তাঁর নাট্যকর্মে একুশের চেতনা নির্ভর বিষয় যেমন এনেছেন তেমনি মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। একুশকে নিয়ে তিনি নাটক কম লিখেছেন তবে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হিসেবে একুশকে ভোলেননি। ভাষা আন্দোলন শুধু বাঙালি জাতির একটা আন্দোলনই ছিল না, পর্যায়ক্রমে সেটা জাতীয় চেতনার আন্দোলনে রূপ নেয়। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের এই আন্দোলনে মানবিক শক্তি, সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশ ঘটেছিল। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর নাট্যভুবনকে সাজিয়েছেন। নাটকের আঙ্গিকগত দিক বিবেচনায় শুধু নয় বরং হাস্য-কৌতুকময় বিষয়বস্তুর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কোনো গভীর সত্যের সন্ধানই তাঁর নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা হিসেবে দেখা গেছে। নাট্যকারের নাটকে সম্পর্কে এক গবেষক বলেছেন,- "ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাঁর নাটকে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় শিল্পতা পেয়েছে।" (স্মারকগ্রন্থ, ২০২০: ১২৪-১২৫)। গবেষকের এই মন্তব্যের সাথে সহমত জানাতেই হয়। কারণ তাঁর এই একুশ ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক

নাটকসমূহ দর্শক-পাঠকদের চেতনাগত বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বোঝাতেও অনুপ্রাণিত করে।

৬.০ উপসংহার

নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ আমৃত্যু ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে নাটককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাঙালি জাতির জীবনে এই বিপ্লবগুলো অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করে এবং স্বাধীনতাকে প্রকৃত অর্থবহ করে তোলে। শোষকের বিরুদ্ধে, নির্যাতকের বিরুদ্ধে, শঠতার বিরুদ্ধে তাঁর কলম ও কণ্ঠ ছিল সর্বদা শাণিত। এই সংগ্রাম তাঁর ব্যক্তিজীবনেও শেষ হয়নি। সমাজের লেবাসধারী স্বাধীনতা বিরোধীদের মূলোৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। তিনি শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী নন, তিনি একজন সম্মুখ সমরের যোদ্ধা। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা একদল বিশ্বাসঘাতক কর্তৃক লুণ্ঠিত হলো, দেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হলো। তিনি তখন তীব্র আবেগে উদ্বেলিত হলেন, চিন্তিত হলেন বাঙালির ভবিষ্যৎ ভেবে। কলম হাতে লিখতে লাগলেন এসবের বিরুদ্ধে নাটক। সেখানে তিনি একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রভাবিত হয়ে সেসব বর্ণচোরাদের মুখোশ উন্মোচন করতে লাগলেন। তাঁর চেতনায় সর্বদা জাগরিত ছিল, একুশে যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছে, মুক্তিযুদ্ধও তেমনি এর পূর্ণতা এনে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে।

৭.০ গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ, মমতাজউদদীন. (২০০০). *আমার নাট্যভাবনা.* বিশ্বসাহিত্য ভবন.
আহমদ, মমতাজউদদীন. (১৯৯৯). *নির্বাচিত নাট্যসম্ভার.* বিশ্বসাহিত্য ভবন.
জয়নুদ্দীন, মোহাম্মদ. (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, ১৩ মাঘ). *একুশের নাটক.* দৈনিক সংবাদ.
জাহান, সৈয়দা খালেদা. (২০০৩). *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ বাস্তবতা.* বাংলা একাডেমি.
আহমদ, মমতাজউদদীন. (২০২০). *স্মারকগ্রন্থ.* বিশ্বসাহিত্য ভবন.
সিদ্দিকী, রতন. (২০০৫). *হৃষীত নাট্যকার মমতাজউদদীন.* বিশ্বসাহিত্য ভবন.

৮.০ গবেষক পরিচিতি

চিন্ময় কুমার মল্লিক (Chinmoy Kumar Mallick)
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ
পিএইচডি গবেষক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: chinmoy.kumar@science.wub.edu.bd